Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী সাত্তার

রোলঃ 227020626

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী সাত্তার

রোলঃ 227020626

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌসুমী সাত্তার, আইডিঃ 227020626 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ তাকওয়া ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মৌসুমী সাত্তার

আইডিঃ 227020626

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

তাকওয়া

তাকওয়া (আরবি : تقوى তাকওয়া / তাকওয়া) হল একটি ইসলামিক পরিভাষা যা আল্লাহর প্রতি সচেতন ও সচেতন হওয়ার জন্য, সত্য, "তাকওয়া, আল্লাহর ভয়।" এটি প্রায়শই কুরআনে পাওয়া যায়। যারা তাকওয়া অনুশীলন করে- ইবনে আব্বাসের ভাষায়, আল্লাহর সাথে শিরক পরিহার করে এবং তাঁর আনুগত্যে কাজ করে এমনবিশ্বাসীরা তাদের বলা হয় মুত্তাকিন (আরবি : المتقين আল মুত্তাকিন)।

ইসলামিক পরিভাষায়ঃ

তাকওয়া (আরবি: تقوى(শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে: দ্বীনদারি, ধার্মিকতা, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ ও সত্যের প্রতি সচেতন এবং পরিজ্ঞাত হওয়া, "ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাকওয়া। অন্যকথায় সকল প্রকার হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়।"অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ ইসলাম" অনুসারে, "তাকওয়া" শব্দটি এবং এর থেকে উৎপন্ন শব্দসমূহ কুরআনে "২৫০ বারের বেশি" উপস্থিত হয়েছে। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়।

তাকওয়া শব্দের অর্থ আল্লাহর ভয়ে কোনো কিছু করা বা না করার বোধ। তাকওয়া ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল হয় না। তাকওয়া ইবাদতের প্রাণ। যেকোনো কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন। কাজি নাসিরুদ্দিন বায়দাবি (রহ.) তাফসিরে বায়দাবিতে তাকওয়ার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো

এক. শিরকমুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী আজাব থেকে বাঁচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘আর তাদের তাকওয়ার কালেমা তথা একত্মবাদের ওপর সুদৃঢ় রাখলেন।’ (সুরা ফাতাহ: ২৬) এই স্তরের মূল কথা হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এই অর্থে একজন সাধারণ মুসলমানও মুত্তাকি বা তাকওয়াবান; যদিও তার থেকে গুনাহ্ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় মুত্তাকুন, মুত্তাকিন, তাকওয়া বহুবচন বা ব্যাপক অর্থবোধক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

দুই. যা করলে পাপ অথবা ছাড়লেও পাপ এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা। এক কথায় সব গুনাহ বর্জন করা। ইসলামি শরিয়তে একেই সাধারণত তাকওয়া বলা হয়। পবিত্র কোরআনের বাণী 'আর যদি সেসব জনপদবাসী ইমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কল্যাণধারা উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছে।' (সুরা আরাফ: ৯৬)

তিন. আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিরত রাখে এমন সবকিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হওয়া। এটিই প্রকৃত তাকওয়া। এদিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করো।' (সুরা আলে ইমরান: ১০২)

এটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। নবী-রাসুলগণ ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী সাহাবায়ে কেরাম, অলি-বুজুর্গগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন।

একবার হজরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে হজরত ওমর (রা.) তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে ওমর, পাহাড়ের দুই ধারে কাঁটাবন, মাঝখানে সরু পথ। এই অবস্থায় কীভাবে চলতে হবে। হজরত ওমর (রা.) জবাব দিলেন, 'সাবধানে পথ চলতে হবে, গায়ে যেন কোনো কাঁটা না লাগে।' হজরত কাব (রা.) বললেন, এটাই তাকওয়া।

তাকওয়া অর্থ আত্মরক্ষা করা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা। অর্থাৎ আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অপরাধ, অন্যায় ও আল্লাহর অপছন্দের কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নাম তাকওয়া।

মহান আল্লাহতায়ালা মানবজাতি এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদতের জন্য। আল্লাহর ইবাদত করার মানে এই নয় যে বাহ্যিক কিছু আমল। বান্দার একনিষ্ঠ ও একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলে কামিয়াব হয়। ক্রমাগতভাবে এই কার্যক্রম চালিয়ে আল্লাহর বড় নেয়ামত পাওয়ার সুযোগ হয়।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় এই কর্মসম্পাদনকেই তাকওয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাকওয়া আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরহেজ করা, বেঁচে থাকা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হলো একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাকে মুত্তাকি বলা হয়। সৎ গুণাবলির মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। যার মধ্যে তাকওয়া থাকে, সে পার্থিব জীবনের লোভে কোনো খারাপ কাজ করে না। সে পরকালীন জীবনের কল্যাণের কাজে সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

ভিন্নভাবেও বলা চলে, সব ধরনের অনিষ্ঠ কাজ থেকে আল্লাহর ভয়ে নিজেকে বাঁচানোর অন্য নামই হলো তাকওয়া। তাকওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মুমিন পরিশুদ্ধতা লাভ করে, ইমান শুদ্ধতার আত্মিক সুখশান্তি লাভ করে। তৌহিদের উপস্থিত প্রফুল্লতায় ভরে উঠে জীবনের চারিধার। তাই একজন মানুষকে মানুষ হতে হলে সর্বাগ্রে তাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে

হবে। তাকওয়াহীন মানুষ হওয়া অসম্ভব। তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়ে সমাজের কল্যাণকামিতা যদি সদা অন্তরে জাগ্রত না থাকে, তাহলে তার দ্বারা ভালো কাজের আশা করা যায় না। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দুর্নীতি করা যায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, দায়িত্বে অবহেলা করা যায়, আমানতের খিয়ানত করা যায়; কিন্তু আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ কারণে তাকওয়াহীন মানুষ মানুষই হতে পারে না।

তাকওয়া-সংক্রান্ত ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, হে মানব, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (সুরা হুজরাত আয়াত : ১৩)

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে, হে মুমিনরা! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ওইসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং
ওইসব লোককে যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আসো, তখন শিকার
করো। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদের বাধা প্রদান করেছিল, সেই
সম্প্রদায়ের শুক্রুতা যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা। (সুরা মায়েদা আয়াত : ২)

তাকওয়া হলো জীবনের প্রতিটি কাজকর্মের অগ্র-পশ্চাতে, দিবা-নিশিতে আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রাখা। আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রেখে আমলের প্রতিটি স্তর পার হতে পারলেই সে তাকওয়া অবলম্বনকারী মুমিন মুত্তাকি হবে। সব ধরনের গোনাহ থেকে সর্বদা নিজেকে গুটিয়ে শরীর ও মনকে পাপ থেকে অক্ষত রেখে দুনিয়ার জীবন পাড়ি দেওয়ার নামই হলো তাকওয়া। এজন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে বর্তমান সমাজে সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির কাঁটা থেকে একজন মুমিনকে আত্মরক্ষা করে খুব সতর্কতার সঙ্গে জীবনপথ পাড়ি দিতে হবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবিরা গোনাহ, অশ্লীল কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে, তাকে মুত্তাকি বলা হয়। মুত্তাকি ব্যক্তি সততা, আমানতদারিতা, ধৈর্য, শোকর, আদল-ইনসাফ ইত্যাদি সব ধরনের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন।

তাকওয়া অবলম্বনের উপকারিতা : তাকওয়া অবলম্বনকারীর ভাগ্যে আল্লাহর নাজাত মিলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, (আগেও) যারা ইমান গ্রহণ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের আমি রক্ষা করেছি (নাজাত দিয়েছি)। (সুরা হামিম আয়াত : ১৮)

তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দার আমল কবুল হয়। আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের ইবাদত কবুল করেন। (সুরা মায়িদা আয়াত : ২৭)

বস্তুত গোনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করা এবং গোনাহ ত্যাগ করা তাকওয়ার একটি প্রকার। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মুত্তাকি হিসেবে গণ্য। তাকওয়ার ক্ষেত্র সীমাহীন বিস্তৃত। এটি যেকোনো ধরনের পদস্খলন থেকে মানুষকে রক্ষা করে, সব মন্দ ও অশ্লীল কথা, কাজ ও পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে রাখে। প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি ও দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়ে নিজের ক্ষতি করা থেকে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের ক্ষতি করা থেকে রক্ষা করে। তাকওয়া জীবনকে এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে, যা সব ধরনের ভীতি, লোভ-লালসা, প্ররোচনা, প্রতারণা, প্রলোভন, পদস্খলন থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখে। আল্লাহতায়ালা আমাদের তাকওয়াপূর্ণ জীবনযাপন করার তাওফিক দান করুন।

তাকওয়া বিষয়ক কুরআনের আয়াতঃ

সুরা বাকারার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,‘এ সেই কিতাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাবধানীদের জন্য এ পথপ্রদর্শক।’ রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়েও আল্লাহ তাকওয়া অর্জনের কথা বলেছেন। সুরা বাকারার ১৮৩ আয়াতে বলা আছে, হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের জন্য রোজার বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো।

তাকওয়া অর্জনের সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

ভালোবেসে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, ঘৃণা করার জন্য নয়। কারো কারো মতে, তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা। আবার কেউ কেউ বলেন, তাকওয়ার অর্থ হলো সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকা। প্রতি বছর রমজান আসে, আমাদের তাকওয়ার বার্তা দিয়ে যায়।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (র.) বলেন, দিনে রোজা রাখা বা রাত জেগে ইবাদত করার নাম তাকওয়া নয়; বরং তাকওয়া হলো আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তা মানা এবং যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচার বর্জন করে কোরআন ও সুন্নতের নিয়মানুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে, তাহলেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা যাবে

يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ- ‘আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। হে জ্ঞানী মানুষ! তোমরা আমাকে ভয় কর’ *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাক্বওয়াকে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় বলেছেন। আর আল্লাহ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ‘আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল মানুষের সাথে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ১৯৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৭৬)*। উপরোক্ত আয়াত সমূহ

দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করার জন্য তাকওয়াই হচ্ছে বড় মাধ্যম।

এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه 'যার কর্ম তাকে পিছে সরিয়েছে, তার বংশ মর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

নবী কারীম (ছাঃ) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا-

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮)*।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে আল্লাহ তার সকল বিষয় সমাধান করে দেন। আল্লাহ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ Galal al لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقْهُ مَخْرَجًا.

يَحْتَسِبُ 'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং এমন সূত্রে তাকে রিযিক দেন যার কল্পনা সে করেনি' (তালাক ২-৩)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تَمُوتُنَّ وَلَا تُقَاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا مُسْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إِلَّا

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিৎ। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না' (আলে ইমরান ১০২)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করতে হবে। আর তাঁকে যে ভয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে মর্যাদা দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِمَن خَافَ مَقَامَ

جَنَّتَانِ رَبِّهِ 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' (আর-রহমান ৪৬)

তাকওয়া/ আল্লাহর ভয়

আল-কুরআন

তাকওয়ার প্রতিদান:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ–ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন

আল ইমরান (আয়াত: ১৩৩-১৩৪)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তাহলে তুমি কি মনে করো , যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভিত স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত উঠালো একটি গর্তের কিনারায় এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের জালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না

আত তাওবাহ (আয়াত: ১০৯)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের ওপর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। কাজেই আমি সেটা এমন লোকদের জন্য নির্ধরিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেবে এবং আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনবে

আল আ'রাফ (আয়াত: ১৫৬)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে

আল-যুমার (আয়াত: ৭৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি -বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল

আল-আনফাল (আয়াত: ২৯)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তারা যে অসৎকাজ করে যাচ্ছিলো তার জন্যে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

আল আ'রাফ (আয়াত: ৯৬)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তাকে কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেন।

আত-তালাক (আয়াত: ২)

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মুছে ফেলবেন এবং তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন

আত-তালাক (আয়াত: ৫)

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম

হুদ (আয়াত: ৪৯)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

যারা তাদের রবকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান।

আল-মুলক (আয়াত: ১২)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ

আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে। নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।

আন নাযিয়াত (আয়াত: ৪০-৪১)

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের মর্যাদা:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা বেশি আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত

আল হুজুরাত (আয়াত: ১৩)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

শোনো, তারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্ম যাতনার অবকাশ নেই

ইউনুস (আয়াত: ৬২-৬৩)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন

আত তাওবাহ (আয়াত: ৭)

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

জেনে রাখো আল্লাহ মুক্তাকীদের সাথেই আছেন

আত তাওবাহ (আয়াত: ৩৬)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাকে ভয় করে

ফাতির (আয়াত: ২৮)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ

নাহল (আয়াত: ১২৮)

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

আন-নূর (আয়াত: ৫২)

তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না

আল ইমরান (আয়াত: ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেককেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছে। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক।

আল-হাশর (আয়াত: ১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও

আত তাওবাহ (আয়াত: ১১৯)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারোর থেকে ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোন সাহায্য পাবে না

আল বাক্বারাহ (আয়াত: ১২৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

আল মায়েদাহ (আয়াত: ৩৫)

বিভিন্ন ইবাদত ফরজের মূল উদ্দেশ্যই হল তাকওয়া অর্জন:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

আল্লাহর নিকট তার গোশত ও রক্ত কিছুই পৌঁছে না। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তোমাদের তাকওয়া

হাজ্জ্ব (আয়াত: ৩৭)

বিভিন্ন ইবাদত ফরজের মূল উদ্দেশ্যই হল তাকওয়া অর্জন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মানব জাতি। ইবাদাত করো তোমাদের রবের , যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো

আল বাক্বারাহ (আয়াত: ২১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদাগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো

আল বাক্বারাহ (আয়াত: ১৮৩)

তাকওয়া বিষয়ক হাদিসঃ

আল-হাদিস

তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেককাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে; মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে। (তিরমিযী, ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৯৯৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي . قَالَ " عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ " . فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ " اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি বলল, এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি সফরের ইরাদা করছি, আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন

আল্লাহ তাকওয়া আবলম্বন করবে। প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলবে। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! তার জন্য দূরত্ব হ্রাস করে দিন এবং তার জন্য সফর সহজ করে দিন। (তিরমিযী,ইসলামিক ফাউন্ডেশন৩৪৪৫)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খূতবার পূর্বে প্রথমে সালাত আরম্ভ করলেন। তাতে আযান ও ইকামত ছিল না। তারপর তিনি, গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ দিলেন। তার (আল্লাহর) অনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করলেন। লোকদের ওয়ায-নসিহত করলেন। তারপর মহিলাদের নিকট গেলেন। তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন, সাদাকা কর। কেননা তোমাদের অধিকাংশ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। মহিলাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা দাঁড়াল। যার উভয় গালে কাল দাগ ছিলা সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা কেন? তিনি বললেন। তোমরা বেশী অভিযোগ করে থাকো। তোমরা উপকারকারীর উপকার অস্বীকার কর। রাবী বলেন তখন মহিলাগণ তাদের অলংকারাদি সাদাকা করতে লাগল। তারা বিলাল (রাঃ) এর কাপড়ে তাদের আংটি, কানের দুল ইত্যাদি ফেলতে শুরু করল। (মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯২১)

বাহ্যিক বেশভূষা তাকওয়া নয় তাকওয়া অন্তরে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَا هُنَا " . وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর ধোকাবাজী করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষন করো না। একে অপরের (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে) পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচা-কেনার চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। তাকওয়া এইখানে, এই কথা বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সীনার প্রতি ইশারা করলেন তিনবার। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলিমের উপর

(প্রত্যেক) মুসলিমের সবকিছু জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু হারাম। (মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩০৯)

রাসূল স. তাকওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

আবদুল্লাহ (রা.) সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি এই বলে দু'আ করতেনঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সচ্চলতার জন্য প্রার্থনা করছি। (মুসলিম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৬৫৬, তিরমিযী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৮৯)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي . قَالَ " زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى " . قَالَ زِدْنِي . قَالَ " وَغَفَرَ ذَنْبَكَ " . قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . قَالَ " وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি সফরের ইচ্ছা করছি আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পাথেয় হিসাবে তাকওয়া দান করুন। লোকটি বলল: আরও কিছু বাড়িয়ে দান করুন। তিনি বললেন: তোমার গুনাহ মাগফিরাত দান করুন। লোকটি বলল: আপনার জন্য আমার পিতা মাতা কুরবান আরো বৃদ্ধি করুন। তিনি বললেন: যেখানেই তুমি থাকনা কেন তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ সহজলভ্য করে দিন। (সূনান আত তিরমিযী ইসলামী ফাউন্ডেশন ৩৪৪৪)

তাকওয়া অর্জনকারীর প্রতিদান:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার (আরশের) ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক)। ২. ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। ৩. ঐ ব্যাক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে জড়িত। ৪. ঐ ব্যাক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবাসে এবং মিলিত হয় এ প্রেরণা নিয়ে এবং পৃথক হয় এ প্রেরণাসহ। ৫. ঐ ব্যাক্তি যাকে কোন অতিজাত সুন্দরী মহিলা (অসৎ কাজে) আহবান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ঐ ব্যাক্তি, যে কিছু দান করল এবং এত গোপনভাবে করল যে, তার ডান হাত জানতে পারল না, তার বাম হাত কি দান

করেছে, ৭. ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর দুই চোখে (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রু ঝরে। (মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২২৫২)

মুত্তাকীর মর্যাদা:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاءَ فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَئُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنْ الْحُتُوفِ وَالشَّهِيدُ مَنْ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ

ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিতঃ উমার ইবনু খাত্তাব (রা) বলেন, মু'মিনের সম্মান হল তার তাকওয়া ও পরহেযগারী অর্জনে, আর দ্বীন হল তাঁর শরাফত ও ভদ্রতা। ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জা হল তার চরিত্র। বাহাদুরী ও ভীরুতা উভয়ই হল জন্মগত গুণ (মুয়াত্তা ৯৮৫)

'দ্যা ম্যাসেজ' এর লক্ষ্য কুরআন-হাদীসের জ্ঞানকে সহজবোধ্য, সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা। যাতে ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষ ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কুরআন-হাদীসের প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন ও নিজের জীবনে তা চর্চার মধ্য দিয়ে আলোকিত ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে উঠবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তাকওয়া এক মহিমান্বিত গুণ

তাকওয়া মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। কুরআন মাজীদে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ফাইরোযাবাদী রাহ. তাঁর কিতাব بصائر ذوي التمييز -এ কুরআনে কারীমে বর্ণিত সুসংবাদগুলো উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমের প্রায় ২৭ স্থানে মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। কিছু সুসংবাদের আয়াত এখানে উল্লেখ করা হল-

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ :

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। -সূরা নাহল (১৬) : ১২৮

২. গুনাহ মাফ এবং বিরাট আজরের সুসংবাদ :

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا.

যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট আজর দান করেন। -সূরা ত্বলাক (৬৫) : ৫

৩. মাগফিরাতের সুসংবাদ :

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। -সূরা আনফাল (৮) : ৬৯

৪. সকল কাজ সহজ হওয়ার সুসংবাদ :

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.

যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার সব বিষয় সহজ করে দেন। -সূরা ত্বলাক (৬৫) : ৪

৫. সফলতার সুসংবাদ :

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا.

নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। -সূরা নাবা (৭৮) : ৩১

৬. প্রশস্ত রিযিকের সুসংবাদ :

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

এবং তাকে রিযিক দান করেন অকল্পনীয়ভাবে। -সূরা ত্বালাক (৬৫) : ৩

৭. সম্মান-মর্যাদার সুসংবাদ :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ.

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে মুত্তাকীগণ। -সূরা হুজুরত (৪৯) : ১৩

৮. আল্লাহর মহব্বতের সুসংবাদ :

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন। -সূরা তাওবা (৯) : ৪

৯. কবূলিয়্যাতের সুসংবাদ :

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকে কবুল করেন। -সূরা মায়েদা (৫) : ২৭

১০. শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ :

وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (কাফেরদের) উপরে থাকবে। -সূরা বাকারা (২) : ২১২

১১. শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত থাকার সুসংবাদ :

فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎ থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনো দুঃখিত হবে না। -সূরা আরাফ (৮) : ৩৫

১২. জান্নাতে বিভিন্ন নিআমতের এবং আল্লাহর দীদার লাভের সুসংবাদ :

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ، فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ.

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে। সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে। -সূরা ক্বমার (৫৪) : ৫৪-৫৫

এখানে কিছু সুসংবাদ ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হল। যবানে নবুওতেও তাকওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

إِنّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্টই। এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা হল, 'মুশতাবিহাত' বা সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে)। অনেক মানুষ এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে না। সুতরাং যে শুবুহাত (সন্দেহপূর্ণ বিষয়) এড়িয়ে চলবে, সে তার দ্বীন ও সম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকবে। আর যে ওই শুবুহাত তথা সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামে নিপতিত হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৯

সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল তাকওয়ার জীবন। হারাম জিনিস থেকে সতর্ক থাকার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে তাঁদের জীবনে। আবু বকর রা.-এর ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلّا أَنّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

আবু বকর রা.-এর একজন গোলাম ছিল। সে তার উপার্জনের একটি অংশ আবু বকর রা.-কে দিত। আবু বকর রা. তা খেতেন। একদিন সে কিছু (খাবার) নিয়ে এল। আবু বকর রা. তা থেকে কিছু খেলেন। তখন সে বলল, আপনার কি জানা আছে, এই খাবার আমি কীভাবে লাভ করেছি? আবু বকর রা. জানতে চাইলে সে বলল, জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। (অর্থাৎ গণকের মত ভবিষ্যতের বিষয় বলেছিলাম।) আমি তো গণকের কাজ পারি না; (তার কাছে গণক সেজেছিলাম) তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে দেখা হলে সে তার বিনিময়ে এ খাবার দিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে আবু বকর রা. তার গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং যা খেয়েছিলেন বমি করে সব বের করে দিলেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৩৮৬

পরবর্তীতে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ, দূর এবং নিকট অতীতের সালাফে সালেহীন সকলেই ছিলেন মুত্তাকী, হারাম থেকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনকারী। তাঁদের জীবনের সবটুকুই ছিল তাকওয়ায় ভরপুর। তাঁদের তাকওয়ার এমন এত অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলোর উপর স্বতন্ত্র কিতাবও রচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর 'কিতাবুল ওয়ারা'।

ইমাম নববী রাহ. তাঁর 'তাহযীবুল আসমা' কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের বড় শায়েখ, 'আলমুহাযযাব ফিল মাযহাব' কিতাবের লেখক ইমাম আবু ইসহাক আশশীরাযী রাহ. ছিলেন খুবই দরিদ্র। কিন্তু সততা এবং তাকওয়ায় পাহাড়-কঠিন। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন কিছু খেতে। বের হওয়ার সময় ভুলে এক দীনার ফেলে আসলেন। কিছুদূর গিয়ে তার মনে পড়ল, তিনি মসজিদে এক দীনার ফেলে এসেছেন। তখন

তিনি আবার মসজিদে গেলেন এবং তার দীনারটি পেয়েও গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁর হালত পাল্টে গেল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কতজনের দীনারই তো এখানে পড়ে থাকতে পারে। এটা যদি আমার না হয়!

এটা তারই ফেলে যাওয়া দীনার- এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু যদি না হয়! হারামের এ সামান্য সন্দেহে তা আর নিলেন না। কারণ, হারাম পেটে যাবে, এটা তো মানা যায় না। তাই দীনারটি তিনি স্পর্শ করলেন না। ফিরে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন সতর্কতা। অথচ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, একটি দীনার ছিল তাঁর জন্য অনেক বড় কিছু। (দ্র. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ২/১৭৩)

তাকওয়ার এত বড় বড় আজর ও পুরস্কার এবং মহামনীষীগণের তাকওয়ার প্রতি এত ইহতিমাম দেখে আমরাও উদ্বুদ্ধ হই তাকওয়া অবলম্বন করতে, মুত্তাকী হতে। তাহলে আমাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। হারাম থেকে এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

চারিদিকে এখন হারামের ছড়াছড়ি। এমনকি আমাদের অনেক খাবারেও এখন হারাম মিশ্রিত হওয়ার খবর শোনা যায়। সুতরাং আমরা সতর্ক ও সচেতন হব। যাচাই-বাছাই করে খাওয়ার অভ্যাস করব। আল্লাহকে ভয় করব।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা- এরই নাম তাকওয়া। সুস্পষ্ট হারাম কী কী তা তো আমরা একটু অধ্যয়ন করলেই জানতে পারি। কিন্তু যেগুলো স্পষ্ট নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মুফতীগণের শরণাপন্ন হব এবং নিজের বুঝবুদ্ধি ব্যবহার করব। আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াওয়ালা জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন- আমীন।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব

রবিবার ১২ আগস্ট ২০১২ | প্রিন্ট সংস্করণ

মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ : প্রারম্ভিকা : ইসলামী আখলাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাকওয়া। তাকওয়া বা আল্লাভীতি মুমিন জীবনের ভূষণ। মানব জীবনে তাকওয়া এমন একটি মহৎগুণ যা মানবকে যাবতীয় কুকর্ম হতে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে।

তাকওয়ার পরিচয় : শাব্দিক অর্থে তাকওয়া শব্দের অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, পরহেজগারী, নিজকে কোন বিপদ ও অকল্যাণ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা বা কোন অনিষ্ট হতে আপনাকে দূরে রাখা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে 'সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মত জীবনযাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে।' যিনিই এ অতীব মহৎ গুণের অধিকারী তিনিই মুত্তাকী বলে অভিহিত।

ইসলাম মানুষকে যে সব চিন্তা, তৎপরতা, কথা, কাজ প্রভৃতি বিষয় নিষেধ করেছে, তা পরিহার করে তথা যাবতীয় মন্দ, অশ্লীল ও অকল্যাণকর দিক বর্জন করে কল্যাণময় দিকগুলো গ্রহণ করাই তাকওয়ার বাস্তবতা।

তাকওয়ার গুরুত্ব : তাকওয়ার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক (তাকওয়া অবলম্বন কর), তাহলে তিনি তোমাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড বা যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন, তোমাদের ভুলত্রুটি ও গুণাহরাশি ক্ষমা করবেন। কেন না আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।" (সূরা আল-আনফাল ২৯) তাকওয়া অবলম্বন করার সুফল ও পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, তার স্থান হবে জান্নাত।" (সূরা-আননাযিয়াত ৪০-৪১)।

ইসলামী জীবন-দর্শনে তাকওয়াই সকল সৎগুণের মূল। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রক বৈশিষ্ট্য। মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক চরিত্র গঠনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। যার মধ্যে তাকওয়া বিদ্যমান সে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। আর যে আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করে, সে কোন পাপ কাজে জড়াতে পারে না। অপর পক্ষে যে তাকওয়া শূন্য তার দ্বারা সকল অপকর্ম করাই সম্ভব। সুতরাং তাকওয়া সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ ও সৎ জীবনযাপনের মূল কথা।

ব্যক্তি জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. ব্যক্তি চরিত্র গঠনে : মানুষের ব্যক্তি জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যক্তি চরিত্র গঠনে তাকওয়ার বিকল্প নেই। যে মুমিনের হৃদয়ে তাকওয়া আছে, সে কোন অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়ে না এবং নির্জন থেকে নির্জনতর স্থানেও পাপ কাজে লিপ্ত হয় না। কারণ, সে জানে সবাইকে ফাঁকি দেয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যায় না। তাই চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ।

২. ইবাদতের মূল বস্তু : তাকওয়া হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগীর মূল বস্তু। ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতার কোন মূল্য নেই, যদি সেখানে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় না থাকে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা "আল্লাহর নিকট তোমাদের কুরবানীর গোশত, রক্ত কিছুই পৌঁছে না, পৌঁছে শুধু এ থেকে অর্জিত শিক্ষা সংযমের অভ্যাস তাকওয়া।" (সূরা আলহাজ্জ : ৩৭)।

৩. ঈমানের পরিপূর্ণতা : আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথভাবে ভয় না করলে, ঈমানের পরিপূর্ণতা আসে না। তাই আল্লাহ তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেন "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে মৃত্যু বরণ করো না। " (সূরা-আল ইমরান-১০২)।

৪. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ : আল্লাহর সান্নিধ্য, নৈকট্য ও সহায়তা লাভের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন : ‘‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, জেনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।’’ (সূরা-আল বাকারাহ : ১৯৪)।

মর্যাদার মাপকাঠি : আল্লাহর নিকট তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি। আল্লাহ ঘোষণা করেন : ‘‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাবান, যার মধ্যে বেশি তাকওয়া আছে।’’ (সূরা-আল হুজুরাত : ১৩)।

৬. জীবনের সাফল্য : তাকওয়ার গুণই মানুষের ইহ-পরকালীন জীবনে সামগ্রিক সাফল্য বয়ে আনবে। আল্লাহ বলেন : ‘‘নিশ্চয়ই তাকওয়াবানদের জন্যে রয়েছে সফলতা।’’ (সূরা আন-নাবা : ৩১)।

৭. আত্মার পরিশুদ্ধি : মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিশোধনের জন্য তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য। হৃদয়ে তাকওয়া থাকলে সে মানুষ কোন অন্যায়-অশ্লীল কাজ করতে পারে না এবং কোন পাপ চিন্তা তার আত্মাকে কলুষিত করতে পারে না।

৮. নিষ্ঠায় : তাকওয়া ব্যক্তি মানুষের চরিত্রে, তার আকীদা-বিশ্বাসে, কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে, ইবাদত-বন্দেগীতে এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার সৃষ্টি করে। তাই সে হয় সকল কাজে অতীব আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান।

৯. ঈমানের মজবুতি : তাকওয়া মানুষের ঈমানের মজবুতি ও পূর্ণতা এনে দেয়। যে ব্যক্তি যত তাকওয়া সম্পন্ন, তার ঈমান তত বেশি মজবুত। সে জীবনে-মরণে কখনো তাকওয়া থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় না। সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং তাকওয়ার সাথে জীবনযাপন করে।

১০. জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ : তাকওয়া মানুষকে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দান করে। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে বলেন: ‘‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল হলো আল্লাহর ভয়।’’ তিনি আরো বলেন, ‘‘সে দু'টো চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না : (ক) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়, (খ) আর যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারায় রত থেকে কাঁদে। (তিরমিযি)

১১. জান্নাতে দু'টি উদ্যান লাভ : মুত্তাকীরা নিশ্চিতভাবে জান্নাত লাভ করবে, তাকওয়ার মানদন্ড অনুযায়ী কেউ কেউ দু'টি উদ্যান লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ বলেন : ‘‘যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য দু'টি উদ্যান রয়েছে।’’ (সূরা-আল-রাহমান : ৪৬)।

১২. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ : তাকওয়ার গুণ অর্জিত হলে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন : ‘‘আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।’’ (সূরা-আত-তাওবাহ : ৪)।

সামাজিক জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণের প্রধান উপকরণ : একটি সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, পুত-পবিত্র, পরিশুদ্ধ সর্বপরি সমৃদ্ধশালী করতে হলে ইসলামী আখলাকের প্রধান গুণ তাকওয়া একান্ত প্রয়োজন। একজন তাকওয়াবান মুমিনের জীবনে সুনাগরিকের সকল গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অবশ্য তাকওয়াবান মানুষ না হলে, একটি সুন্দর, শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায় না। তাই সমাজের সকল সদস্যকে তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করা অপরিহার্য।

২. সামাজিক শৃক্সখলায় তাকওয়া : সমাজে শান্তি-শৃক্সখলা রক্ষায় তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেননা তাকওয়াবান মানুষ তার কাজ-কর্মে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আর আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে সমাজের সদস্যগণ যদি দায়িত্ব পালন করেন, তবে সে সমাজ অবশ্যই শান্তি ও শৃক্সখলাময় হতে বাধ্য।

৩. সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে তাকওয়া : সামাজিক জীবনে সামাজিক মূল্যবোধে তাকওয়া অপরিহার্য তাকওয়া সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাই একজন তাকওয়াবান মানুষ কখনও অপরের অধিকার হরণ করে না, অপরকে কষ্ট দেয় না, অন্যায়-অনাচার থেকে নিজে বেঁচে থাকে, সমাজকে এ থেকে বাঁচায়। সমাজের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হয় এমন কাজ তার দ্বারা হয় না।

৪. সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া : সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য তাকওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। তাকওয়াবান মানুষ সমাজে কখনো ন্যায়-নীতির বিপরীত কোন কাজ হতে দেয় না এবং সেও করে না। আল্লাহ বলেন : ‘‘তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর। কেন না ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তাকওয়ার খুব নিকটবর্তী। (সূরা -আল মায়িদাহ : ৮)।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও আস্থা : সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। তাকওয়াবিহীন সমাজে সামাজিক আস্থা ও নিরাপত্তা গড়ে উঠে না।

৬. আত্ম-সামাজিক উন্নয়নে তাকওয়া : আত্ম-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাকওয়া একটি বড় গুণ। যদি সমাজের লোকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ থাকে, তবে সমাজের সদস্যরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজের আত্ম-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার জন্য কাজ করে থাকে। আর দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মূল উৎস হচ্ছে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। তাই আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য তাকওয়াবান হওয়া অপরিহার্য।

৭. সুনাগরিকতার গুণ অর্জনে তাকওয়া : সুনাগরিকতার প্রধান গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর তাকওয়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগরিত হয়।

৮. সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতিতে : সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টিতে তাকওয়ার বিকল্প নেই। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষের মনে অপর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-স্নেহ সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি গড়ে

তোলে। যাবতীয় ভেদ-বৈষম্য ও পার্থক্য দূরীভূত করে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকলে মিলেমিশে জীবনযাপন করে।

৯. সামাজিক মর্যাদায় : সমাজে সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ সমাদৃত হয় ও মর্যাদা পায়। আর সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য তাকওয়ার গুণ অর্জন করা একান্ত দরকার।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। আর যে সমাজের মানুষের মধ্যে এ গুণ অর্জিত হয়, সে সমাজ হয় সুখী সমৃদ্ধশীল। তাকওয়াবান মানুষ কখনও ব্যক্তি ও সমাজকে ফাঁকি দেয় না। তাই মানুষ ব্যক্তি জীবনে যেমন হয় সৎ, তেমনি সমাজ জীবনে হয় কর্তব্যনিষ্ঠ। এ জন্য সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা একমাত্র তাকওয়া দ্বারাই সম্ভব।

তাকওয়ার মাধ্যমেই লাভ হয় সংকট থেকে উত্তরনের উপায়ঃ

ঈমানী সিফাত বা যেসব গুণাবলির সম্পর্ক ঈমানের সাথে এবং ঈমানের কারণে যেসব গুণাবলি মানুষের মধ্যে পয়দা হয়- ঈমান যত মজবুত হয় ওই গুণগুলো তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুণগুলো যত বাড়তে থাকে, ঈমানও তত মজবুত হতে থাকে। ঈমানী সিফাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিফাত তাকওয়া। তাকওয়াকে বলা হয় 'মিলাকুল হাসানাত'- তথা সমস্ত নেকীর মূল। এটা কেবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং সবচেয়ে বড় সিফাত। কুরআন কারীমের বহু আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে, আবার অনেক আয়াতে তাকওয়ার ফায়দাগুলোর বিবরণও দেওয়া হয়েছে। গতকাল তারাবীতে সূরা ত্বলাক তিলাওয়াত করা হয়েছিল। সেখানে একসঙ্গে কয়েকটা ফায়দার কথা এসেছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে-

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا.

এটা এমন বিষয়, যার দ্বারা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ্ই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

-সূরা ত্বলাক (৬৫) : ৩

এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পারিবারিক জীবনের কিছু বিধান দান করেছেন। বিধানগুলোর বলার পর শেষে বলেছেন-

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ.

অর্থাৎ বিধানকে ‘নসীহত’ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। হালাল-হারামের বিধান, ফরয বিধানÑ এসবকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ‘ওয়াজ’ বা ‘নসীহত’। কুরআনের ওয়াজ বা নসীহত শব্দ থেকে অনেকে গলত ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে, এ তো কেবল উপদেশ; মান্য করলে ভালো, অমান্য করলেও কোনো সমস্যা নেই! অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ গলত। বরং কুরআন কারীমে ‘ওয়াজ’ ‘যিকির’ ‘নসীহা’ শব্দগুলো যেভাবে উত্তম-অনুত্তম, মুস্তাহাব ও গায়রে মুস্তাহাব বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ফরয বিধানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অনেক বছর আগের কথা। এক বুদ্ধিজীবীর লেখায় দেখেছিলাম, সে বলছে, শরীয়ত কেবল একটা উপদেশমূলক বিষয়। কুরআনকে আল্লাহ উপদেশ হিসেবে পাঠিয়েছেন; কিন্তু এই যে চাপিয়ে দেওয়া, এটা মওলবীদের কাজ। আল্লাহ কিন্তু চাপিয়ে দেননি, বরং তিনি একটা উপদেশ দিয়ে রেখেছেন।

অথচ কুরআনকে আল্লাহ তাআলা ‘যিকির’ হিসেবে যেমন অবতীর্ণ করেছেন, তার অবস্থান কীÑ সেটাও তিনি কুরআন কারীমে জানিয়ে রেখেছেন। এই যিকির ও উপদেশ থেকে যে বিমুখ হবে, তার ঠিকানা যে জাহান্নাম, তাও তিনি বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَعْمٰی، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْۤ اَعْمٰی وَ قَدْ كُنْتُ بَصِیْرًا، قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَ كَذٰلِكَ الْیَوْمَ تُنْسٰی، وَ كَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْۢ بِاٰیٰتِ رَبِّهٖ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰی.

আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে রব্ব! তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!

আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে ও নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে না, তাকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই। আর আখেরাতের আযাব বাস্তবিকই বেশি কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী। -সূরা ত্বহা (২০) : ১২৪-১২৭

وَ مَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ یَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.

আর কেউ তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে গেঁথে দেবেন। -সূরা জিন (৭২) : ১৭

وَ مَنْ یَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَیِّضْ لَهٗ شَیْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِیْنٌ.

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়। -সূরা যুখরুফ (৪৩) : ৩৬

‘যিকরুন’ ‘ওয়া‘যুন’ এসব শব্দ থেকে বিধানগুলোকে মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক পর্যায়ের বিষয় ধারণা করা জাহেলদের স্বভাব। যাদের কুরআনের ভাষা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তারাই কেবল এমন কথা বলতে পারে।

‘উপদেশ’ শব্দ এলেই বিধানটা ঐচ্ছিক হয়ে যায় না। কুরআনের বিধানাবলি ও শরীয়তকে কুরআন কারীমের ভাষায় উপদেশও বলা হয়েছে, আবার সেই উপদেশ অমান্য করা হলে বা তা থেকে বিমুখ হলে দুনিয়াতে বরবাদি এবং আখেরাতে জাহান্নামের ঘোষণাও কুরআনে দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতেও অনেকগুলো ফরয বিধানের আলোচনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলছেন-

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

এই নসীহত তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, যাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে।

লক্ষ করুন, উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার ভাষাটা কেমন? বলা হচ্ছে-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

যদি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান থাকে, তবে এই ওয়াজ গ্রহণ করো। এটা তো তাকীদের সর্বোচ্চ ভাষা। কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করার জন্য ভাষার এই শৈলীটা অত্যন্ত মজবুত। সরাসরি জরুরি বলার চেয়ে এটা বেশ কঠিন নয় কি? আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান থাকলে তুমি এই উপদেশ গ্রহণ করো।

এরপর বলা হয়েছে-

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

(যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে।)

অনেক সময় একটা বিধানের ওপর আমল করতে মানুষের মনে বিভিন্ন ভয় কাজ করে। আমি পেরে উঠব কি না! ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিলে এরপর কী করব? আয়ের উৎস হারাম। এটা তাৎক্ষণিক ছেড়ে দিলে এরপর কী হবে? মনের মধ্যে একটা পেরেশানী কাজ করে। এই পেরেশানীর কারণে কোনো কোনো সময় কাউকে বলা হয়, তুমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হও! একেবারে নগদ এখনই সব ছেড়ে দিলে যদি আবার টিকতে না পারো বা আরো বড় পাপে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে কী হবে! এসব চিন্তা করে তাকে বলা হয়, ধীরে ধীরে হালালের দিকে আসতে থাক!

এটা তাকে মাসআলা দেওয়া হয় না; বরং একটা পরামর্শ। কীভাবে হারাম ছেড়ে হালালের দিকে আসতে পারব, সেটা কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন এই আয়াতে।

আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে।

তুমি যদি তাকওয়ার পরিচয় দিতে পার, আল্লাহ তোমার জন্য কোনো না কোনো রাস্তা বের করেই দেবেন।

যদিও এই হিম্মতটুকু সবার হয় না। কিন্তু কেউ যদি হিম্মতটা করতে পারে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাহলে তার ব্যবস্থা করবেনই।

مَنْ يَّتَّقِ اللهَ.

আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহকে হাযির-নাযির মনে করে তাঁর বিধানের সম্মান রক্ষার্থে, তাঁর হুকুম পালনের জন্য এবং তাঁকে রাজি-খুশি করার জন্য আর আল্লাহর সামনে কী জওয়াব দেবে- এই ভয়ে সে হিম্মত করল যে, আমি সহীহটাই গ্রহণ করব আর গলতটা এখনই ছেড়ে দিব। তাহলে-

يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا.

আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার জন্য পথ খুলে দেবেন। শুধু তা-ই নয়; বরং-

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

সে কোনো দিন ভাবেনি, ভাবতেও পারেনি যে, এই পথ থেকে আমার জন্য হালাল রিযিক আসবেÑ সে পথে, সে মাধ্যমে তাকে রিযিক দান করবেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা আবার বলেন-

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ.

আল্লাহর ওপর যে ভরসা করবে, আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট।

এটি তাকওয়ার অন্যতম ফায়দা যে, আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দাকে সংকটমুক্ত করে দেন। তার জন্য এমন দিক থেকে রিযিকের পথ খুলে দেন, যা কখনো তার কল্পনায়ও আসেনি। আর আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। তাই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর কাছে সবকিছুর একটা সময় আছে এবং নির্ধারিত পরিমাণ আছে। তাই সবর তো করতেই হবে।

এখানে একথাও মনে রাখা দরকার, তাকওয়া দ্বারা যেমন পেরেশানী দূর হয়, তাকওয়ার বিপরীত চললে পেরেশানীও আসে এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছিল। যা নাজায়েয কাজ। পরক্ষণে সে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে আসে এবং বাঁচার রাস্তা খোঁজে। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি তো আল্লাহ্কে ভয় করনি! (ভয় করলে তো আর একসাথে তিন তালাক দিতে না।) আল্লাহ তো বলেছেন, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য কোনো রাস্তা খুলে দেবেন। আর তুমি তো তা করনি!

কয়েক আয়াত পরেই আল্লাহ তাআলা আবার বলেন-

ذٰلِكَ اَمْرُ اللهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا.

এসব আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছেন। (এগুলোর অধিকাংশই পারিবারিক বিধান) যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তার সওয়াব ও প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেবেন।

এভাবে যদি আমরা কুরআন কারীম তিলাওয়াত করি, তাহলে তাকওয়ার অনেক ফায়দা দেখতে পাব, ইনশাআল্লাহ। বিধান দেওয়ার আগে একবার তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, বিধান বর্ণনা করার পর আবারও তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে তাকওয়ার ফায়দাও জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআন কারীমে তাকওয়ার প্রায় তিরিশের কাছাকাছি ফায়দার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ফাইরোযাবাদী রাহ. (৮১৭ হি.)-এর রচিত একটি কিতাবের নাম ‘বাসাইরু যাবিত তাময়ীয ফী লাতাইফিল কিতাবিল আযীয’। তিনি আমাদের তালেবে ইলম ভাইদের নিকট বেশি পরিচিত- ‘আলকামূসুল মুহীত’ কিতাবের লেখক হিসেবে। তার এই কিতাবে তাকওয়ার একটা অধ্যায় আছে। সেখানে তিনি তাকওয়ার অনেকগুলো ফায়দা উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি ফায়দা আমরা এখন আলোচনা করছি!

সূরা ত্বলাকের দুই আয়াতে চারটা ফায়দার কথা আমরা আলোচনা করেছি। সূরা আনফালের-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ..

অর্থাৎ, যদি তুমি তাকওয়ার রাস্তা অবলম্বন কর, তাকওয়ার যিন্দেগী অবলম্বন কর, আল্লাহকে ভয় কর এবং এর তাকাযা পূরণ কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার মধ্যে পার্থক্য করার একটা যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেবেন। হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা, সুন্নত-বিদআতের মাঝে পার্থক্য করা, কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করা, হেদায়েত ও গোমরাহীর মাঝে পার্থক্য করা ইত্যাদি। আসলে উদাসীন যিন্দেগী হলে সব জায়গায় প্যাঁচ লাগায়। কারণ পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। ঈমান যত মজবুত হয়, তত মানুষের হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা বাড়তে থাকে। মুত্তাকী-মুমিনদের মাঝে এই সিফাতটা বেশি মাত্রায় থাকে। পক্ষান্তরে গাফলত যত বাড়বে, তাকওয়ার ব্যাপারে যত উদাসীনতা হবে, ততই পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। পার্থক্য করার জন্য শরীয়তের দলীল কুরআন-সুন্নাহ তো আছেই, সেটাই মানদণ্ড। কিন্তু আমি যখন নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনের বিষয়গুলোকে শরীয়তের বিধানের আলোকে বিচার করা শুরু করব, তখন আমার নিজেরও তো বুঝতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার কোন্ কাজটি ঠিক হচ্ছে আর কোন্টি ভুল- পার্থক্য করার এই বুঝটুকু তাকওয়া দ্বারা বাড়ে। আমাকে আরেকজন বুঝিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি বুঝিই না। সবাই আমাকে বোঝাচ্ছে, মুরব্বিরা বোঝাচ্ছেন, ঘরের বড়রা বোঝাচ্ছেন, কিন্তু বুঝেই আসছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আরেকজন সহজেই বুঝে ফেলছে। একটু

ইশারার মাধ্যমেই ধরে ফেলছে। কেন এমন হয়? মূলত তাকওয়ার সিফাত যার যত বাড়বে, ততই ফুরকান- তথা পার্থক্য করার যোগ্যতা ও সিফাতটাও বাড়তে থাকবে।
কুরআন কারীম হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী। সহীহ ও গলতের মাঝে পার্থক্যকারী। সুন্নত-বিদআত এবং খায়র ও শার- তথা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী। ঠিক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সীরাতও এসবের মাঝে পার্থক্য করে।
তাই শরীয়তের দলীল বাদ দিয়ে কারো একথা বলার অধিকার নেই যে, আমি তাকওয়ার দৃষ্টিতে এই বিধান বুঝেছি, নাউযুবিল্লাহ। এমন চিন্তাটাই তো গোমরাহী। তাহলে সে লোক আবার মুত্তাকী হল কীভাবে?!
اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا.
(তোমরা যদি আল্লাহর সাথে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন।)
তালিবে ইলম ভাইয়েরা এখান থেকে আরো আলোও নিতে পারেন যে, যে তালেবে ইলমের মধ্যে তাকওয়ার গুণ যত বেশি হবে তার মধ্যে কুরআন ও হাদীসের ফাহ্ম ও বুঝ তত বেশি হবে।
সূরা ত্বলাকের আয়াতে আরেকটি কথাও বলা হয়েছে-
وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.
যার মধ্যে তাকওয়া যত বেশি হবে, আল্লাহ তাআলা তার বিষয়গুলো তত সহজ করে দেবেন। [দ্র. সূরা ত্বলাক (৬৫) : ৪]
আমাদের তো পেরেশানী ও শেকায়েতের শেষ নেই। কমবেশি সবারই পেরেশানীর শেকায়েত আছে। বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন ঝুট-ঝামেলা থাকেই। হাঁ, আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাদের যিন্দেগীতেও পেরেশানী হয়। তবে তার ধরন ভিন্ন।
এই আয়াতে বলা হয়েছে, তাকওয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা সহজতা দান করেন। এছাড়াও আখেরাতে তাকওয়ার কী কী ফায়দা, দুনিয়াতেও আরো কী ফায়দা রয়েছে, মনোযোগসহ কুরআন তিলাওয়াত করলে তার অনেকগুলো বা কিছু আমরা নিজেরাও ধরতে পারব- ইনশাআল্লাহ।
আর একটা কথা বলেই আমি শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন-
اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথী, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ইহসানের অধিকারী হয়। [দ্র. সূরা নাহল (১৬) : ১২৮]
যাদের মধ্যে তাকওয়া ও ইহসানের সিফাত আছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে আছেন। অর্থাৎ আল্লাহর নুসরত, তাঁর ফযল ও করম এবং তাঁর দয়া ও করুণা- সবকিছু মুত্তাকীদের সঙ্গে।

তাকওয়া ও ইহসানের সিফাত একটা অপরটার পরিপূরক। তাকওয়া হলে ইহসান আসবে, ইহসান আসলে তাকওয়া আসবে। তাকওয়া এবং ইহসানের সিফাত যাদের মধ্যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নুসরত, ফযল ও করমও তাঁদের সঙ্গে।

তাকওয়ার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল করণীয়টা করা, বর্জনীয়টা বর্জন করা। আল্লাহ যা ফরয করেছেন, তা আদায় করা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু তাকওয়ার স্থান হল কলব বা অন্তর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলবের দিকে ইশারা করে বলেছেন-

التَّقْوَى هَاهُنَا.

তাকওয়ার মূল অন্তরে।

অর্থাৎ, আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখা, হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস রাখা এবং আমি আল্লাহর নিআমতে ডুবে আছি- এই অনুভূতি-উপলব্ধি সদা জাগরূক রাখা- এটিই তাকওয়ার মূল। এগুলো থাকে অন্তরে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তাকওয়ার মূল অন্তরে।

কিন্তু তার প্রকাশ ঘটবে- আল্লাহ যা ফরয করেছেন, তা পালনের মধ্য দিয়ে এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। এই দুটোর মধ্যেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, যা থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা।

তাকওয়া অবলম্বনের মধ্যে যেমন ফায়দা রয়েছে, তাকওয়া-বিমুখ হওয়ার মধ্যেও রয়েছে সমূহ ক্ষতি। সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি হল, গোমরাহী পেয়ে বসা। কেবল এতটুকু নয় যে, কিছু গুনাহ হয়ে গেল; বরং এটা ধীরে ধীরে মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। আজ ফজরের নামাযে ইমাম সাহেব তিলাওয়াত করেছেন সূরা

তাওবা থেকে-

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ..

আল্লাহ এমন নন যে, কোনো সম্প্রদায়কে হেদায়েত করার পর গোমরাহ করে দেবেন, যাবৎ না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, তাদের কোন্ কোন্ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। -সূরা তাওবা (৯) : ১১৫

আল্লাহ কাউকে হেদায়েত দান করার পর পুনরায় সে গোমরা হবে কেন? গোমরা হওয়ার তো কথা ছিল না। কুরআন-সুন্নাহ্র মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে হক ও হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই রাস্তা মজবুতির সঙ্গে ধরলে তো গোমরা হওয়ার কথা নয়। তার পরও কেন কিছু মানুষ গোমরা হয়ে যায়? ঈমান ও ইসলামের আলো পাওয়ার পরও কিছু মানুষকে দেখা যায় দুর্ভাগ্যবশত গোমরা হয়ে যাচ্ছে! কেন হয় তাদের এই দশা? কাকে বলে ইসলাম- তার পরিচয় পাওয়ার পরও কেন তাকে গোমরাহী পেয়ে বসে?

কারণ হল-

حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ.

কী কী বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং দূরে থাকতে হবে, সেটি আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া সত্ত্বেও সে বেঁচে থাকেনি বা থাকতে পারেনি। নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এটা হারাম, ওটা নাজায়েয। এসব থেকে তোমরা বেঁচে থাক! তার পরও যদি কেউ বিরত না থাকে, বরং গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তার কাছে তো গোমরাহী আসবেই। এজন্য বলছি, তাকওয়া অবলম্বনের মধ্যে যেমন ফায়দা রয়েছে, তাকওয়া-বিমুখ হওয়ার মাঝেও রয়েছে সমূহ ক্ষতি। সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি হল, মানুষকে গোমরাহী পেয়ে বসে। রমযানুল মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ যেন আমাদের মধ্যে তাকওয়ার মেযাজ দান করেন। এই সিফাত হাসিল হলে ইনশাআল্লাহ, হক-বাতিল ও সহীহ-গলতের মাঝে পার্থক্য করা সহজ হবে। অন্যথা গোমরাহী পেয়েই বসবে। গোমরাহী মানে কী? গোমরাহী মানে কারো রাস্তা-ই ভিন্ন হয়ে যাওয়া। 'গোম' অর্থ হারিয়ে যাওয়া আর 'রাহ' অর্থ রাস্তা। 'গোমরাহ' মানে রাস্তা হারিয়ে ফেলা ব্যক্তি। 'গোমরাহ' কোনো গালি নয়, বরং এটি বাস্তবতা। কেউ যদি বাস্তবেই হকের রাস্তা হারিয়ে ফেলে, তাকে 'গোমরাহ' বলা কোনো গালি দেওয়া নয়। এক্ষেত্রে কেউ যদি আমাকে সংশোধন করে দেয় যে, ভাই, রাস্তা এটা নয়; ওটা। তাহলে নিশ্চয়ই সে আমার প্রতি ইহসান করেছে; অন্যায় কিছু করেনি। দুনিয়াতে যেমন কোথাও যাওয়ার সময় আমার পথ ভুল হতে পারে। কেউ আমাকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলে এটি আমার প্রতি তার ইহসান ও করুণা। তার প্রতি আমার শোকরগুযার হওয়া উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, আখেরাতের বেলায় এটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার ক্ষেত্রে কেউ স্বেচ্ছায় রাস্তা হারায় না। কিন্তু আখেরাতের ক্ষেত্রে অনেককে দেখা যায়, ইচ্ছা করেই গলত রাস্তায় চলে। হয়তো না বোঝার কারণে অথবা হঠকারিতাবশত। না বোঝার কারণে কেউ গোমরাহীর পথে চলে গেলে ভালো করে বোঝানো হলে সে হয়তো ফিরেও আসে। কিন্তু হঠকারিতাবশত যে গলত রাস্তায় চলে, তার কী হাশর হবে? তার তো অন্তরে ব্যাধি আছে।

সারকথা, তাকওয়ার জরুরত আমাদের ঈমানী যিন্দেগীতে অনেক বেশি- এক হল, তাকওয়ার ফায়দাগুলো বেশি বেশি অর্জন করার জন্য, আরেক হল তাকওয়ার অভাবে যেসব ক্ষতি ও আশঙ্কা হয় সেগুলো থেকে রক্ষার জন্য।

সূরা বাকারার শুরুতেই তাকওয়ার কথা এসেছে।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত। -সূরা বাকারা (২) : ২

কুরআন কারীম থেকে হেদায়েত পাওয়ার জন্য তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর তাকওয়ার অভাবে কুরআন কারীম থেকে মাহরূম হওয়ার কথাও কুরআন কারীমে রয়েছে।

কাজেই বিষয়টা খুবই জরুরি। তবে তাকওয়ার বিষয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা যে তাকওয়ার নির্দেশ করেন এবং যে তাকওয়ার ওপর মূল ফায়দা দান করেন সেটি হল, কুফর-শিরক ও মুনাফেকী থেকে বেঁচে থাকা এবং সমস্ত গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা। বিশেষত কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এই তাকওয়াটা ফরয। এই তাকওয়ার বরকতেই আল্লাহ তাআলা এসব ফায়দা দান করে থাকেন। এই তাকওয়ার বরকতেই আল্লাহ তাআলা সমস্ত ক্ষতি ও আশঙ্কা থেকে হেফাযত করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ.

তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাক, তাহলে সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮০৯৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩০৫

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাকওয়া হাসিল করার তাওফীক দান করুন। সমস্ত কুফর, শিরক, গোমরাহী ও হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন।

←